BL College Journal
https://doi.org/10.62106/blc2023v5i2bg5
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -V, Issue-II, December 2023
Pp. 39-52

‘কল্লোল’ পত্রিকার শতবর্ষ : বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের ভূমিকা

শংকর কুমার মল্লিক

শংকর কুমার মল্লিক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail : mallickkhluna@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য সাময়িক পত্রের মধ্যে একটি ‘কল্লোল’। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ এর প্রথম সংখ্যা আলোর মুখ দেখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা পৃথিবীতে যখন ভাঙা-গড়ার পালাবদল চলছে সেরকম সময়েই কল্লোলের আত্মপ্রকাশ। দীনেশরঞ্জন দাস, গোকুলচন্দ্র নাগ, সতীপ্রসাদ সেন-এরকম প্রাণময় কর্মনিষ্ঠ স্বপ্ন-বিভোর আত্ম-প্রত্যয়ী অথচ আর্থিক সংস্থান-শূন্য কয়েকজন তরুণ কল্লোলের ভ্রূণ তৈরি করেন। ‘কল্লোল’ শব্দের আভিধানিক অর্থকে অল্পকিছুদিনের মধ্যে সত্যে পরিণত করেছিলেন আরও বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি-লেখক-আড্ডাবাজ মানুষ। সাগরের উর্মিমালার মতো তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে আছড়ে পড়েছিলেন ‘কল্লোল’ এর তটরেখায়। দীনেশরঞ্জন দাশের মেজোদাদার বাড়ি ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের দু’খানা ঘরে কল্লোলের দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল। মানিকতলায় এক বন্ধুর প্রেস থেকে প্রথম কয়েকমাস পত্রিকাটি ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। একেবারে অনাড়ম্বর জাঁকজমকশূন্য পরিবেশে দরিদ্র ঘরের সন্তান জন্মের মতো উৎসবহীন ছিল ‘কল্লোল’ এর জন্ম। বাইরে এর ঐশ্বর্য ও জৌলুস না থাকলেও কল্লোলের সদস্যদের প্রাণোচ্ছল আনন্দ ও আবেগের ঐশ্বর্য ছিল আকাশ ছোঁয়া। মাত্র সাত বছরের আয়ুষ্কালে সেকালে ‘কল্লোল’এর সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে একেবারে নবীন লেখক সকলেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। কল্লোলের লেখকরা বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ও ভাবধারায় কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে পেরেছিলেন। মানুষের জীবন ও সমাজের অচর্চিত ও অনালোচিত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আলো ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কারণে তাঁদের সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য শত্রু এবং মিত্র উভয়ই সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ‘কল্লোল’ পত্রিকা এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লেখকগোষ্ঠী যারা পরবর্তীকালে ‘কল্লোলীয়’ বা ‘কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক’ বলে পরিচিত হয়েছিলেন, তারা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেয়েছিলেন। ‘কল্লোল’ পত্রিকা প্রকাশের শতবর্ষে দাঁড়িয়ে অনুভব করি বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব এবং সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব।

মূলশব্দ

কল্লোল পত্রিকা, কল্লোলযুগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তরুণ লেখক গোষ্ঠী, বাংলা সাহিত্যে প্রভাব

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণধর্মী। এখানে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকা

বিশশতকের তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে 'কল্লোল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'কল্লোল'। 'কল্লোলে'র আয়ুষ্কাল অন্য অনেক প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ পত্রিকার মতো দীর্ঘ না হলেও তার প্রভাব ছিল ব্যাপক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের চেতনায় যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম-সম্প্রদায়, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর যেমন পড়েছিল তেমনি পড়েছিল সাহিত্য ও শিল্প চেতনায়। এতোদিনের বাংলা সাহিত্য ও শিল্প ভাবনায় রোমান্টিকতা ও কলা কৈবল্যবাদী ভাবনার প্রায় একচ্ছত্র রাজ্যপাট ছিল। সেখানে এসে জায়গা করে নিয়েছিল জীবনের সুগভীর বাস্তবতা। এই সময়ের তরুণ লেখকরা তাঁদের সাহিত্যকর্মে সৌন্দর্যচেতনার পাশাপাশি জীবনের হতাশা, গ্লানি, যৌন-চেতনাকে স্থান দিয়েছিলেন। তা নিয়ে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্বও তৈরি হয়েছিল চোখে পড়ার মতো। দুঃসাহসী, প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকরা জড়ো হয়েছিলেন 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। 'কল্লোল' তাঁদেরকে একই মৃণালে শতদল হয়ে ফুটে উঠতে সাহায্য করেছিল। আবার তাঁদের সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছিল 'কল্লোল' পত্রিকাকে।

বিশ্লেষণ

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা 'কল্লোল' প্রকাশিত হয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ। তবে কল্লোলের জন্মের বীজ নিহিত ছিল ফোর আর্টস ক্লাবের সত্তার গভীরে[১]। ফোর আর্টস ক্লাব বা চতুষ্কলা সমিতি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এই স্বপ্নায়ু সংগঠনটির স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ। নারী-পুরুষের সম্মিলনে গড়ে ওঠা এই ক্লাবের চর্চার বিষয় ছিল চারটি। সাহিত্য, সংগীত, চিত্রশিল্প ও কারুশিল্প। ক্লাবের অপর দু'জন কর্ণধার ছিলেন সুনীতি দেবী ও সতীপ্রসাদ সেন। ১৯২১ ও ১৯২২ এই দুই বছর চলার পর ফোর আর্টস ক্লাবের অকাল প্রয়াণ ঘটে। ক্লাব ভেঙে গেলেও তার প্রতিষ্ঠাতা ও অন্য সদস্যরা হতাশ না হয়ে বরং নতুন একটি পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। খুব বেশি প্রস্তুতি ছাড়াই তাঁরা কাজে নেমে পড়েছিলেন। পত্রিকার প্রকাশের জন্য লেখা, ছাপার খরচ কোনোকিছুই সেভাবে না থাকলেও কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। মনীন্দ্রলাল বসুর লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আর প্রবাসী পত্রিকার সাথে যুক্ত সুধীর কুমার চৌধুরীর লেখক যোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রেখে গোকুলচন্দ্র নাগের আত্মপ্রত্যয়, সতীপ্রসাদ সেনের অসামান্য কর্মনিষ্ঠা এবং দীনেশরঞ্জন দাশের নিপুণ পরিচালন ক্ষমতায় কল্লোলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। 'কল্লোল' নাম দিয়েছিলেন স্বয়ং সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। তিনি লিখেছেন, "নাম ঠিক করিয়া ফেলিলাম-

'কল্লোল'। গোকুলের ব্যাগে ছিল এক টাকা আট আনা, আমার কাছে ছিল দুই টাকা-এই সম্বল লইয়া দোকান হইতে কাগজ কিনিয়া একটি ছোট প্রেসে কল্লোলের প্রথম হ্যান্ডবিল ছাপা হইল। চৈত্র মাসের ৩০ তারিখে চৈত্র সংক্রান্তি, সং দেখিতে পথে বিপুল জনতা হয়। সেই সুযোগে গোকুল ও আমরা কয়েকজন মিলিয়া হ্যান্ডবিল বিলি করিতে বাহির হইয়াছিলাম। ইহার পূর্বেই কল্লোলের কিছু কপি প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয়। বিধাতার সাহায্যে ১৩৩০-এর পহেলা বৈশাখ 'কল্লোল' ছাপিয়া বাহির হইল।"[২] কল্লোলের কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল দীনেশরঞ্জন দাশের মেজদাদার বড়ি ১০/২ পটুয়াটোলা লেনের- দু'খানা ঘরে। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল একদল প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। বয়সে তারা প্রায় সবাই নবীন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং নতুন লেখক। কারো লেখা হয়তো অন্য দু'একটা পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে আবার কারো লেখা হয়তো মনোনীত না হয়ে ফেরত এসেছে। কিন্তু তাদের লেখক হওয়ার মতো মেধা, প্রতিভা, যোগ্যতা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, পড়ালেখা সবটাই আছে। পূর্বপরিচিত, সদ্যপরিচিত, অর্ধপরিচিত সকলের সম্মিলনে এবং তুমুল আড্ডার মধ্যে কল্লোলের জীবনপ্রবাহ চলে। বাঙালির জন্মাগত ধাত আড্ডা দেওয়া। বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির সাথে আড্ডার গভীর যোগসূত্র রয়েছে। সে আড্ডার জন্মসূত্র মুখ্যত কোনো না কোনো পত্র-পত্রিকা। 'কল্লোল' এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। কল্লোলের অফিস ঘর, তার আসবাবপত্র সবক্ষেত্রে দারিদ্র্য ছিল চোখে পড়ার মতো। আড্ডাধারীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তবে কল্লোলের আড্ডার রসে সবাই বুদ হয়ে থাকতেন। কোনোদিক থেকেই সেখানে আরামের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না, তবু কল্লোলের আড্ডার আসরের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। আড্ডাধারী হরিহর চন্দ্র লিখেছেন–

> এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লীর মধ্যে সর্বপ্রকারের বাহ্য আড়ম্বর এবং সর্বপ্রকারের আকর্ষণশূন্য সেই গৃহকোণটির পরিচয় দশের দুই পটুয়াটোলা লেন। এই গৃহের একতলায় বসিবার জন্য ছোট একখানি ঘর আছে। ...শিল্পী দীনেশরঞ্জনের হাতে সেই ঘরখানি "নিমেষে নিমেষে নিতুই" রূপ দেখিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, তাঁর আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে বোধ করিয়াছি, স্বেচ্ছায় ও পরমানন্দে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই অপ্রশস্ত ঘরে আমাদের জীবনের সর্বোত্তম দিনগুলির অধিকাংশ কি করিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তার কোনও হিসাব নিকাশ নাই।[৩]

কল্লোলের আড্ডায় যারা নিয়মিত আসতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–

> অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পবিত্র গাঙ্গুলি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ভূপতি চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, মুরলীধর, অজিত সেন, সতীপ্রসাদ সেন (গোরাবাবু), সুবোধ দাশগুপ্ত, হরিহর চন্দ্র, নির্মল সিংহ, সোমনাথ সাহা, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, বুদ্ধদেব বসু, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী, অমলেন্দু বসু, বিষ্ণু দে, সুকুমার ভাদুড়ী, বিজয় সেনগুপ্ত, মণীশ ঘটক, সনৎ সেন, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র বাগচী, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন দাস, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।[৪]

কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তাঁরাই পরবর্তীকালে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক

হিসেবে পরিচিতি পান এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্লোল যুগ বা কল্লোল কালপর্বের জন্ম হয়। ভারতবর্ষে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালির আবেগ স্তিমিত হয়ে আসে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কারণে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিলেও যুদ্ধ শেষে তা মিথ্যায় পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশ্ববাসীর মনের গভীরে গাঢ় রেখাপাত করে। মানুষের এতকালের আদর্শ ও বিশ্বাসের মর্মমূলে অভিঘাতের সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের বিশেষকরে বাংলার যুব-মানসে সঞ্চারিত হয় এক বিপুল নৈরাশ্য। বাঙালির চিন্তা-মনন ও সৃষ্টি রাজ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। আর্থ-সামাজিক কারণে জীবন সম্পর্কে পূর্বের ধ্রুব বিশ্বাস ও আদর্শ-নিষ্ঠার অবক্ষয় ঘটে মানুষের মনে। যুদ্ধ পরবর্তী কালের ভাঙনে তরুণ সমাজের তখন অর্থনৈতিক স্থিতি নেই;- সংশয় হতাশা, দৈন্য নীতিহীনতা তারুণ্য শক্তিকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। চারিদিকে শূন্যতার অগ্নি বলয়, হতাশা থেকে আসতে শুরু করেছে নিঃসঙ্গতা ও নৈরাজ্য। কল্লোলের তরুণ লেখক গোষ্ঠী ছিলেন এই নৈরাজ্য-নৈরাশ্য পীড়িত যুব সমাজের প্রতিনিধি। তাই কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের প্রেক্ষাপট ছিল যুগের তাড়না। যুগচিন্তার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে কল্লোল তার বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উড়িয়ে চলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা বাংলার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। একদিকে তীব্র খাদ্য ও বস্ত্র সংকট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বাংলার নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। যুব চিত্তের এই যন্ত্রণা 'কল্লোল' এর রচনাগুলিতে ভাষা রূপ লাভ করেছিল।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পেষণে নৈরাশ্য পীড়িত যুব সমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্যাণ চেতনা ও পবিত্র ভাবমূর্তি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল। ফলে কাব্য ক্ষেত্রের মতোই কল্লোলের তরুণ কথাসাহিত্যিকেরাও নতুন উপাদানের সন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। কল্লোলের তরুণ লেখকেরা রোমান্টিক ভাবালুতাকে বিসর্জন দিয়ে নগ্ন বাস্তবের মাটিতে নেমে আসতে চাইলেন। তাদের রচনায় প্রেম ও সৌন্দর্যের ধারণায় রবীন্দ্র-বিরোধিতা প্রকট হয়। কল্লোলের সাহিত্যিকেরা দেহকেন্দ্রিক জৈব প্রেমের কামনা-বাসনার চিত্র, কদর্য জীবনের আদিম সৌন্দর্যকে রূপায়িত করেন। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলতে পারি;– "যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[৫]

১৯১৩-'১৪ নাগাদ মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড তাঁর যৌন বিষয়ক তত্ত্বে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ভিতটিকে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দেহাতীত প্রেমের ভাব কল্পনার পরিবর্তে দৈহিক কামনার বাস্তবতা স্বীকৃতি পেয়েছিল কল্লোলের তরুণ সাহিত্যিকদের লেখনীতে। উগ্র বাস্তবতার পথ ধরে যৌনতার অনুপ্রবেশ ঘটে কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে। সেই সাথে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উগ্র বাস্তবতা সঞ্চারিত হয় কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে। শ্রমিকবস্তি, ফুটপাতবাসী, গণিকাপল্লী, ও অন্যান্য নিচুতলার মানুষের নগ্ন আদিম স্থূল জীবন চিত্র উঠে আসে কল্লোলের কথাসাহিত্যের উপকরণ হিসেবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন–

"রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে; কয়লাকুঠিতে, বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[৬]

সাম্যবাদ ও কমিউনিজম্ এর প্রভাবও 'কল্লোল' পত্রিকার তরুণ লেখক গোষ্ঠীকে নিচুতলার মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কনে উদ্দীপ্ত করেছিল। আসল কথা বাস্তবতার চর্চা, রবীন্দ্র বিরোধী মানসিকতা, যৌনতার কুণ্ঠাহীন

প্রকাশ, নিচুতলার মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কন, নৈরাশ্য ও যুগ যন্ত্রণার প্রকাশ, সাম্যবাদী চেতনা, যৌবনাবেগ ও বিদ্রোহ চেতনাই 'কল্লোল' পত্রিকাগোষ্ঠীর সাহিত্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। 'কল্লোল' পত্রিকা এবং এর নতুন লেখকদের অন্যতম প্রসন্ন প্রশ্রয়দাতা ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। নতুনের প্রতি, প্রবাহমানতার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল প্রবল। তাই এই প্রতিশ্রুতিশীল নতুন লেখকদের সতত উৎসাহিত করতেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন :

> "বলতেন, 'এমন ভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা, তুমি অভিনব।'
> 'আমার সামনে আর কেউ বসে নেই ?' চমকে উঠতাম।
> 'না।'
> 'রবীন্দ্রনাথ ?'
> 'রবীন্দ্রনাথও না ! তোমার পথের তুমিই একমাত্র পথকার। সে তোমারই একলার পথ। যতই দল বাঁধো প্রত্যেকে তোমরা একা'।"[৭]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথের কমলা বক্তৃতামালা শোনার সময় সেই সময়ের তরুণ ছাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন এবং বলেছেন তার পরে আর কিছুই লেখার এবং বলার নেই। কিন্তু কল্লোলের আসরে এসে তাঁর সেই ভুল ভেঙে যায়। নতুন স্বপ্নে এবং ভাবে তিনি বিভোর। এটাই ছিল কল্লোলের অন্তর্ভেদী শক্তি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন–

> বক্তৃতা শুনতে-শুনতে এই সব ভাবতুম বসে বসে। ভাবতুম, রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সব-কিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু 'কল্লোলে' এসে আস্তে আস্তে সে-ভাব কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আছে আরো ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ-তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ। সেদিনকার 'কল্লোলে'র সেই বিদ্রোহ-বাণী উদ্ধতকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলুম কবিতায় :
>
> এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যথার্থ অহংকার,
> যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
> কারেও ডরি না কভু; সুকঠোর হউক সংসার,
> বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
> পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর!

গভীর আত্মোপলব্ধি-এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নর-জন্ম-সম্ভাবনা ;
অক্ষরতুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি-নবীন প্রেরণা !
শক্তির বিলাস নহে, তপস্যার শক্তি আবিষ্কার,
শুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
আপন বক্ষের তলে; আপনারে তাই নমস্কার।
চক্ষে থাক্ আয়ু-উর্মি, হস্তে থাক্ অক্ষয় লেখনী ![৮]

কল্লোলের পাতায় অচিন্ত্যকুমারের এই আত্ম-আবিষ্কারের ঘোষণা শুধু তাঁকেই নয় সমকালীন বহু নতুন লেখককে উজ্জীবিত ও প্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, কল্লোলের রবীন্দ্র-বিরোধিতার সম্পর্কে যে জনশ্রুতি পরবর্তীকালে প্রচারিত হয়েছিল তা এই কবিতাটির জন্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেখানে যে সমস্ত রাজারাজড়ার কাহিনী দেখতে পাই তারা বাঙালির বাস্তবজীবনে দূরে থাক কল্পনার মধ্যেও ছিল না। যেখানে তিনি বাস্তব মানুষের কথা বলেছেন সেখানেও গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথের মতো জমিদার-নন্দনদেরই প্রাধান্য-সাধারণ মানুষরা আছে শুধু তাদেরই জীবনের প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ সেই বাংলা কথাসাহিত্যকে উঁচুতলা থেকে কিছুটা টেনে নামিয়ে এনেছিলেন বাস্তব পটভূমিতে-উচ্চ-মধ্যবিত্ত কিংবা পল্লীবাংলার মাটির মায়েরা সেখানে কম-বেশি স্থান পেলেন। শরৎচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন একেবারে সাধারণ মানুষের আঙিনায়, তাদের হৃদয়ের কাছাকাছি। তার পরবর্তীকালের লেখকরা-পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকগণ আরও সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এসেছিলেন। এই পটভূমিকায় কল্লোল পত্রিকার বিদ্রোহী-বিপ্লবী নবীন লেখকরা শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন না-তাঁরা দাঁড়ালেন জনগণের স্বপক্ষে, তাদের জীবনের শরিক হয়ে। জনগণের কাছাকাছি আসাকে সেই সময়ে কেউকেউ তাঁদেরকে বস্তিবিলাস বা শ্রমিকবিলাস বলে নিন্দা জানালেও ইতিহাসের কাছে তা জনচেনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমাদের সমাজের দরিদ্র্য ও নিপীড়িত মানুষেরা বর্ণগত এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই অন্ত্যজ শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। আমাদের সাহিত্যিকদের, কাছে এই অন্ত্যজ মানুষেরা এতকাল সুবিচার পায়নি। তাদের সম্পর্কে লেখকদের বিমুখতা না থাক, অপরিচয়ের অজ্ঞতা ছিলই। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র মনুষ্যত্বের অবমাননা যেখানে দেখেছেন সেখানেই বন্ধনের পীড়ন অনুভব করে সহানুভূতি দেখিয়েছেন, তবে তাঁদের দৃষ্টি মুখ্যত ছিল সামাজিক কুসংস্কার-পীড়িত জনবিন্যাসের দিকে। কল্লোলের লেখকরা এই উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে চোখ মেলে দাঁড়ালেন। কুলি-মুটে-মজুরের অস্তিত্বের নানা সংকটের-ভাষাচিত্র আঁকলেন। কল্লোলের পৃষ্ঠায় নানা জাতীয় মানুষের ভিড়-ধনী-নির্ধন-মধ্যবিত্ত, জমিদার-ব্যবসায়ী, কুলি-মজুর-চাষী, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শূদ্র। সবকিছু মিলিয়ে দেখা যায় ধর্ম-বর্ণ-অর্থগত প্রান্তজনেরাই নতুন অর্থ বহন করে সাহিত্যের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। নবীন লেখকরা যেন শোভাযাত্রা করে সেইসব অচ্ছুত মানুষকে সাহিত্যের রাজদরবারে স্থান দিলেন। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকের জনচেতনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য এখানেই।

কল্লোলগোষ্ঠীর জনমুখী দৃষ্টি সে-কালে প্রচুর আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সেটাই মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন তাঁরা। সময়ের পথ কেটে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নতুন ভাবধারা সৃষ্টিই তাঁদের অন্বিষ্ট ছিল। সমকালীন দেশ এবং বিদেশের রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এইসব তরুণ লেখকদের মনোজগতে গভীর রেখাপাত করেছিল, কার্যকর উপাদান জুগিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে নতুন মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের ক্ষেত্রেও উপস্থিত ছিল, সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের সাহিত্যিক মনের রসায়নে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে কতখানি সংরক্ষিত ও সংহত হয়েছিল সেটাই কল্লোল যুগের সাহিত্য-বিচারে প্রধান লক্ষণীয়। দেখা যাবে কল্লোলের নবীন লেখকরা নতুন নতুন প্রবণতার প্রবর্তনায় বাংলা সাহিত্যকে অনেকখানি বদলে দিতে পেরেছিল এবং তার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটলেও প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল প্রবীণ লেখকরা নবীনদের কাছে সাহিত্যের মালাবদল করতে যথেষ্ট কুণ্ঠিত ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ ছিলেন ব্যতিক্রম।

কল্লোল পত্রিকা এবং কল্লোলগোষ্ঠীর-আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যৌবনের পূজা। যদিও তাদের আগেই 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী সেই সাধনায় যুক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো চিরযৌবনা কবি সেখানে যৌবনের জয়গান করে কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু কল্লোলগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল যৌবনের জয়পতাকা উড়িয়ে। যে বীজমন্ত্র তাঁদের সাহিত্যচর্চার-মূলগত প্রেরণা জুগিয়েছিল তা হচ্ছে যৌবনের সজীবতা। প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা নয়, স্থিরবুদ্ধির বিবেচনাও নয়, আবেগতাড়িত যৌবন-ধর্মের অবিবেচনাই ছিল তাঁদের পথচলার পাথেয়। কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের শুরুতেই আমরা উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেই ভাব-বৈশিষ্ট্য দারুণভাবে প্রত্যক্ষ করি। কল্লোলের প্রাণ-পুরুষ গোকুলচন্দ্র নাগকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন– 'যৌবন-পথিক, নব বসন্তের সুরভিত দক্ষিণ বাতাস'। কল্লোলের পাতায় সেই যৌবনের- দুরন্ত উচ্ছ্বাস খুব সহজেই লক্ষ করা যাবে। কয়েকজন কবির কয়েকটি কবিতার-অংশবিশেষ এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে জাগল তরুণ প্রাণ;
জমাট করা অন্ধকারের বিশাল প্রাচীর টুটে
উৎসারিত আলোর পানে বেরিয়ে এল ছুটে-
চক্ষে তাহার নবীন দীপ্তি কণ্ঠে নূতন গান।[৯]

–"কল্লোল", সুনীতি দেবী

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণু-সম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে![১০]

–"শাপভ্রষ্ট", বুদ্ধদেব বসু

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে–
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে ![১১]

– "সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে", কাজী নজরুল ইসলাম

আজ দরজায়
তাই ত' কবি ডাক্ দিয়ে যায়–
ফাগুন ফুরায়–
আগুন জুড়ায় !
মধু-মাসের মহোৎসব দস্যু হ'য়ে লুটবি কে আয়
ছিনিয়ে নেবার সাহস যে চাই–
বিনিয়ে কাঁদিস্ কার ভরসায় ?[১২]

–"কবি-নাস্তিক", প্রেমেন্দ্র মিত্র

তব দগ্ধ আতপ্ত চুম্বনে
যৌবন উঠুক দুলি' উচ্ছ্বসিয়া ধরিত্রীর স্তনে।
সঙ্কোচ-লজ্জিত ম্লান যত ব্যথা জমেছিল শীতে,
বাষ্প হয়ে যাক উড়ে তব সৌম্য নয়ন-ইঙ্গিতে !
আন আন অগ্নির ঝটিকা,
মরণের যজ্ঞে জ্বাল যৌবনের দীপ্ত হোমশিখা
হে পবিত্র![১৩]

–"সূর্য", অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

"হে নূতন জাগরণ, হে ভীষণ, হে চির-অধীর,
হে রুদ্রের অগ্রদূত, বিদ্রোহের ধ্বজবাহী বীর...
ঝঞ্ঝার প্রবাহে নাচে কেশগুচ্ছ, গৈরিক উত্তরী,
সেথা তুমি জীর্ণে নাশি নবীনের ফুটাও মঞ্জরী,
হে সুন্দর, হে ভীষণ, হে তরুণ, হে চারু কুমার,
হে আগত, অনাগত, তরুণের লহ নমস্কার।।"[১৪]

–তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্লোলের যাত্রা শুরু হয়েছিল 'গল্প-মাসিক' হিসেবে। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা ছিল-'কল্লোল-মাসিক গল্প-সাহিত্য। দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ভাদ্রসংখ্যা পর্যন্ত প্রচ্ছদ পটে লেখা থাকতো 'বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য'। ১৩৩১ এর আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনেও কল্লোল সম্বন্ধে বলা হয়– 'বাংলার মাসিক গল্প-সাহিত্য পত্রিকা'। তবে শুরু থেকেই কল্লোলের পৃষ্ঠায় দু'একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কবিতার সংখ্যা বেড়েছে। বেশ করেকটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে প্রবন্ধ। এমনকি কল্লোলের পাতায় প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবিও ছাপা হয়েছে। তবে শতবর্ষ আগে

কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প এবং উপন্যাস নিয়েই বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। মৌলিক এবং অনূদিত দু'রকম গল্প সেখানে প্রকাশিত হতো। মৌলিক গল্পকারদের মধ্যে সুনীতি দেবী, কেতকী দেবী, শৈলজানন্দ, প্রবোধ সান্যাল, সোমনাথ সাহা, মিনতি দেবী, বিজয় সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শান্তা দেবী, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), নির্মল কুমার রায়, জলধর সেন, জগদীশ গুপ্ত, তারানাথ রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রীতি সেন, উমা মিত্র, রমেশচন্দ্র দাশ, প্রমথ চৌধুরী, নিরুপমা দেবী, অমলেন্দু বসু, পঞ্চানন ঘোষাল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্র কুমার রায়, তারানাথ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রণব রায়, দেবকী বসু, বিষ্ণু দে, মায়া দেবী, কল্যাণী পাল প্রমুখ।[১৫]

> কল্লোল' পত্রিকায় মোট এগারোটি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের রচয়িতা হিসেবে আমরা যাঁদের পেয়েছি- গোকুলচন্দ্র নাগ ('পথিক'), হরিপদ বসু ('ঘাটের পথে'), নরেন্দ্র দেব ('যাদুঘর'), সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ('স্মৃতির আলো'), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ('বেদে'), প্রেমেন্দ্র মিত্র ('মিছিল'), দীনেশরঞ্জন দাশ ('দীপক'), সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ('রূপছায়া'), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ('পান্থবীণা' ও 'ডাক-পিয়ন')।

কবিদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জসীম উদ্‌দীন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, দীনেশরঞ্জন দাশ, কালিদাস নাগ, অমিয় চক্রবর্তী, হুমায়ুন কবির, হেমচন্দ্র বাগচী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, বন্দে আলী মিয়া, মনোজ বসু প্রমুখ। কল্লোলের লেখক তালিকায় বেশকিছু নারী লেখককে আমরা পাই। তাঁদের মধ্যে সীতা দেবী, শান্তা দেবী, সুনীতি দেবী, নীলিমা বসু, সরোজ কুমারী দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, নৃসিংহদাসী দেবী উল্লেখযোগ্য।[১৬] কল্লোলের একটি লক্ষ্য ছিল পাঠক-পাঠিকাকেও লেখক হিসেবে গড়ে তোলা এবং নতুন লেখককে উৎসাহ জোগানো। কোনো নতুন লেখকের লেখা মনোনীত না হলেও সম্পাদকের টেবিল থেকে প্রেরণামূলক চিঠি যেত লেখকের কছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তের চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত :

> জাহাজে বসে এতদিন যত লিখেছে সুবোধ, তারই থেকে একটা গল্প বেছে নিয়ে কী খেয়ালে সে "কল্লোলে" পাঠিয়ে দিয়েছিল। আরো অনেক কাগজে সে পাঠিয়েছিল সেই সঙ্গে, হয় খবর এসেছে মনো- নয়নের, নয় ফেরৎ এসেছে লেখা-সেটা এমন কোনো আশ্চর্যজনক কথা নয়। কিন্তু "কল্লোলে" কী হল ? "কল্লোল" তার গল্প অমনোনীত করলে, সম্পাদকীয় লেপাফায় লেখা ফেরৎ গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে গেল একটি পোস্টকার্ড। "যদি দয়া করে আমাদের আফিসে আসেন একদিন আলাপ করতে!" তার মানে, লেখা অপছন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু লেখক, তুমি অযোগ্য নও, তুমি অপরি ত্যাজ্য। তুমি এসো। আমাদের বন্ধু হও।
>
> ঐ পোস্টকার্ডটিই গোকুল।
> ঐ পোস্টকার্ডটিই সমস্ত "কল্লোলে"র সুর। "কল্লোলের" স্পর্শ।
> তার নীড়-নির্মাণের মূলমন্ত্র ।

> খবর শুনে মন নরম হয়ে গেল। আমার লেখা বাতিল হলেও আমার মূল্য নিঃশেষ হয়ে গেল না এত বড় সাহসের কথা কোনো সম্পাদকই এর আগে বলে পাঠায়নি। যা লিখেছি তার চেয়ে যা লিখব তার সম্ভাব্যতারই যে দাম বেশি এই আশ্বাসের ইসারা সেদিন প্রথম পেলাম সেই গোকুলের চিঠিতে।[১৭]

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা আরও চমকপ্রদ এবং তীব্র। তাঁর সেই প্রথম যৌবনের লেখা যখন কোথাও ছাপা হচ্ছে না বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অফিস থেকে অমনোনীত হয়ে ফিরে আসছে কখনো কখনো তার সাথে জুটছে কিছু কিছু অপমানসূচক বাণী ও বক্তব্য। মনের কষ্টে নিজের লেখা কবিতা, গল্প, নাটিকা সব পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। পুরনো কল্লোলের পাতা থেকে ঠিকানা পেয়ে পাঠালেন 'রসকলি' গল্প। তার পরে কী ঘটেছিল তা লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত–

> মনে পড়ে গেল 'রসকলি'র কথা-সেটা তো পোড়ানো হয়নি এখনো! তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে গল্পের শেষ পৃষ্ঠাটা সে নতুন করে লিখলে। ও পৃষ্ঠার পিঠে "প্রবাসী"তে পাঠাবার সময়কার পোস্টমার্ক পড়েছে, তাই ওটাকে বদলানো দরকার-পাছে এক জায়গার ফেরৎ লেখা অন্য জায়গায় না অরুচিকর হয়। জয় দুর্গা বলে পাঠিয়ে দিল লেখাটা। যা থাকে অদৃষ্টে ।
>
> অলৌকিক কাণ্ড-চারদিনেই চিঠি পেল তারাশঙ্কর। শাদা পোস্টকার্ডে লেখা। সে-কালে শাদা পোস্টকার্ডের আভিজাত্য ছিল কিন্তু চিঠির ভাষায় সমবস্থ আত্মীয়তার সুর। কোণের দিকে গোল মনোগ্রামে "কল্লোল" আঁকা, ইতিতে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। মোটমাট, খবর কি? খবর আশার অধিক শুভ-গল্পটি মনোনীত হয়েছে। আরো সুখদায়ক, আসছে ফাল্গুনেই ছাপা হবে। শুধু তাই নয়, চিঠির মাঝে নির্ভুল সেই অন্তরঙ্গতার স্পর্শ যা স্পর্শমণির মত কাজ করে : 'এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন ?
>
> পবিত্রর চিঠির ঐ লাইনটিই তারাশঙ্করের জীবনে সঞ্জীবনীর কাজ করলে। যে আগুনে সমস্ত সংকল্প ভস্ম হবে বলে ঠিক করেছিল সেই আগুনই জ্বাললে এবার আশ্বাসিকা শিখা। সত্য পথ দেখতে পেল তারাশঙ্কর। সে পথ সৃষ্টির পথ, ঐশ্বর্যশালিতার পথ।[১৮]

কল্লোলের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ উঠেছিল সেকালে। সে অভিযোগ সাহিত্যে অশ্লীলতা সৃষ্টি ও যৌনতার প্রকাশ নিয়ে। যদিও সে অভিযোগ সবকালে নতুন লেখকদের বিরুদ্ধে কম-বেশি থেকেছে। বিধবার প্রেম থেকে অসামাজিক প্রেমের দায় বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক লেখককে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। যে বিধবার প্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে বঙ্কিম তথাকথিত অপরাধ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'তে তার আরও বাস্তবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজেছিলেন। এবং সেই বলিষ্ঠ মানসিকতার জন্যই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে 'চোখের বালি' (১৯০৩) হয়ে উঠেছিল আধুনিক উপন্যাসের পথিকৃৎ। তাঁর 'বড়দিদি" ও 'পল্লীসমাজ' সেই একই দৃষ্টিসূত্র অবলম্বন করে লিখিত। অন্যপূর্বা নারীর সধবা অবস্থায় পূর্বপ্রেমের জের টানার উদাহরণ বঙ্কিম সাহিত্য থেকে উৎসারিত হয়ে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' ও 'স্বামী'তে আরও দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই অসামাজিক প্রেমকে বাংলা উপন্যাসে বিশ শতকের প্রারম্ভে নূতন করে রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহিত অবস্থায় অন্য পুরুষের প্রতি প্রেম সঞ্চারের কাহিনি রচনা করে-

লিখলেন শতাব্দীর শুরুতে "নষ্টনীড়" (১৩০৮) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬)। আর দেখালেন "স্ত্রীর পত্র"-এর (১৩২১) স্বামীর চরণাশ্রয়ছিন্ন মৃণালকে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতির মহিমা ও জীবনের স্থির মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, তার ভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক খননকার্য চালিয়ে দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রও পিছিয়ে রইলেন না-'চরিত্রহীনে'র (১৯২৭) কিরণময়ী ও 'গৃহদাহের (১৯২০) অচলাকে তিনি উপস্থাপিত করে প্রেমের শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তিনীতির নতুন সত্যকে স্থায়িত্ব দিলেন। তাঁর হাত ধরে গণিকার প্রেমও বাংলা উপন্যাসের রাজসভায় এসে উপস্থিত হলো। কল্লোলের লেখকদের এই দুঃসাহস বাংলা সাহিত্যের নতুন পথ নির্মাণ করে দিয়েছিল। জীবেন্দ্র সিংহরায় লিখেছেন :

> "কল্লোল-পূর্ববর্তী কালে এই নারী-সমস্যা সামাজিক বিদ্রোহ ও যৌনবাস্তবতার রূপ নেয় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের গল্প উপন্যাসে। নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়ে"র ঢঙে লিখলেন "ঠানদিদি" (১৯১৮), 'শুভ্রা' (১৯২০),'শাস্তি' (১৯২১), 'পাপের ছাপ' (১৯২২), 'দত্তগিন্নী', 'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৯১৯), 'অগ্নিসংস্কার' (১৯২০) ইত্যাদি কাহিনীতে নর-নারীর জীবন ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তিনি সাহসিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন। বিবাহিতা নারীর স্বামী-গৃহ ত্যাগ ও প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ, প্রৌঢ়া নারীর পরপুরুষে গোপন আসক্তি, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপাচারের চিত্র রচনায় তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বশবর্তী হয়ে এক ধরনের আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন।[১৯]

যৌনতা মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক বিষয়। তাকে এড়িয়ে যাওয়া মানে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে এড়িয়ে যাওয়া। কল্লোলের লেখরা সেটা করেননি। যদিও তাঁদের পূর্বসূরীরা প্রেমভাবনায় এবং নর-নারীর যুগল জীবনের কথা বলতে গিয়ে শরীরের চেয়ে আত্মার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর জোর দিয়েছেন বেশি। কিন্তু নতুন লেখকরা জীবনের ছবি আঁকতে শুধু আত্মার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে দেহাতীত প্রেমের কথা না বলে যৌন জীবনের বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন নির্মোহভাবে। এক্ষেত্রে তাঁদের সাহস জুগিয়েছিল প্রায় সমকালীন কিছু বাঙালি লেখক এবং একইসাথে বিদেশী লেখকও। সমকালীন যুগভাবনায় যৌন-জীবন, পাপ-পুণ্যবোধের নবতম ভাবনা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন :

> "আধুনিক কালে বিজ্ঞান এ প্রসঙ্গে চিরকালের পাপ-পুণ্য ও যুগানুগ নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নটাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। একালে সম্ভোগ-চরিতার্থতা ও ইন্দ্রিয়জ আনন্দ জীবনের সার্থকতার অঙ্গ, তাতে পাপের প্রশ্ন ওঠে না। বরং এই শারীরপ্রবৃত্তিকে চেপে রাখলে গোপন সুড়ঙ্গপথে সামাজিক দুর্নীতির জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই আধুনিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিজ্ঞান সম্ভোগের বিষয়টাকে জীবনের প্রকাশ্য অঙ্গনে এনে দাঁড় করাবার পক্ষপাতী। তবে সমস্যা হচ্ছে এইখানে যে সম্ভোগের সঙ্গে প্রজননের সম্ভাব্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেই সম্ভাব্যতাকে কতটা রোধ করে রাখা যায় সেদিকেই বিজ্ঞানের লক্ষ্য সমধিক। 'কল্লোলগোষ্ঠী' তাঁদের সৃষ্টির আসরে দৈহিক সম্ভোগস্পৃহাকে কতকটা প্রকাশ্য করতে চেয়েছিলেন এবং প্রেমের ক্ষেত্রে দৈহিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যে অবান্তর নয় এ কথাটি প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী ছিলেন। তাতে পাপ যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে আদি

পাপ এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের সুস্থ দৈহিক চাহিদার ক্ষেত্রে সম্ভব বা উচিত নয়। তাই কল্লোলীয়রা সামাজিক 'চুপ-চুপ নীতি' উপেক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজের জবরদস্তিমূলক নীতিতে এবং তারই অনিবার্য পরিণামে গোপন অসংযমে আমরা সেক্সকে যে বিষ করে তুলেছি তা দেখাতে গিয়ে তাঁরা আঁকলেন রোগ ও বিকৃতির চিত্র। সুতরাং এটা স্পষ্ট, যে, 'কল্লোল গোষ্ঠী' সেক্স বা যৌনতার আলোকে জীবন ও সমাজের শুভাশুভের প্রশ্নটাকে নতুন করে যাচাই করতে চাইছিলেন। অবশ্য তাঁদের দৃষ্টি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ছিল না, অনেকটা ঘোলাটে দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা যৌন-জীবনের ছবি এঁকেছেন বলে সেগুলো কতকটা বিকৃতির দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।"[২০]

মাত্র সাত বছরের জীবনকালে কল্লোল যেমন কিছু ভক্ত গ্রাহক, লেখক, পাঠক সংগ্রহ করতে পেরেছিল, তেমনি সৃষ্টি করতে পেরেছিল কিছু শত্রু ও কঠোর সমালোচক। বিশেষকরে সজনীকান্ত দাস এবং তাঁর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সাহিত্যে অশ্লীলতা, যৌনতত্ত্ব, দুর্নীতি ও পারিবারিক সম্পর্কের অসম্মান ইত্যাদি এবং তার সাথে কর্ম ও স্টাইলের বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে একদিকে শনিবারের চিঠিতে তীব্রভাষায় সমালোচনা শুরু করলেন, অন্যদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ জানালেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের চিঠির উত্তরে নিজের শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক ক্লান্তির কথা বলে আপাত চুপ থাকলেও সেই রবীন্দ্রনাথের অভিভাবকত্বে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে দুইদিন ব্যাপী শালিশ-বৈঠক বসেছিল।[২১]

সজনীকান্তের আশা ছিল রবীন্দ্রনাথ নব্য লেখকদের খনিকটা তিরষ্কার করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রকৃতি, আদর্শ, চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, নিজের সাহিত্যরুচি ইত্যাদি বিষয়ে চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। নতুন লেখকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরক্তিতো নয়ই বরং অশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁদের অনেকের মধ্যে তিনি বড় লেখকের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের সেই ভবিষ্যৎ ভাবনা কতটা অভ্রান্ত ছিল রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও নানাভাবে নিপীড়িত। তারা বর্ণগত ও অর্থগত উভয় অর্থেই অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের কাছে তারা যথার্থ সুবিচার এতকাল পায়নি। তাদের প্রতি লেখকদের অবজ্ঞা না থাকলেও অজ্ঞতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ লেখক মনুষ্যত্বের অবমাননাকে সহ্য করেননি, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তবে তাঁদের দৃষ্টি ছিল প্রধানত সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনবিন্যাসের দিকে। কল্লোলের নতুন লেখকরা এতোকালের উপেক্ষিত দিগন্তের দিকে দৃষ্টি ফেলেছিলেন। কুলি, মুটে, মজুরসহ নিম্নবিত্তের সাধারণ মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের বয়ান উঠে এলো তাঁদের লেখায়। কল্লোলের পাতায় দেখা গেল এতোকালের অনালোচিত অনালোকিত মানুষের ভিড়। যারা ছিল পেছনের অন্ধকারে নিমজ্জিত, তারা উঠে এলো লেখকের চেতনায়, সৃষ্টিতে। কল্লোলীয়রা কল্লোলের পাতায় সবাইকে স্থান দিয়েছিলেন। তবে তা লেখকের দৃষ্টি ও সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী। ধনী-নির্ধন, মধ্যবিত্ত, জমিদার-ব্যবসায়ী, কুলি-মজুর-চাষী, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-শুদ্র, নারী-পুরুষ সবাই

আছে সেখানে। সমস্ত শ্রেণি-পেশার মানুষ নতুন অর্থ নিয়ে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এসে মিলেছেন। সেদিক থেকে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের জনচেতনার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্য নিঃসন্দেহে সুদূরপ্রসারী।

উপসংহার

কল্লোল পত্রিকা, কল্লোলের আড্ডাধারী এবং লেখকগোষ্ঠী পরবর্তীকালের সাহিত্যে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন তা সহজেই অনুমেয়। স্বকালে কল্লোলের সাহিত্যরুচি ও আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও কালান্তরে আমরা দেখি পরবর্তী লেখকরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। যে নতুনের বার্তা এবং যৌবনের দীপ্তি নিয়ে কল্লোল আবির্ভূত হয়েছিল মাত্র সাত বছরের আয়ুষ্কালে তাঁর স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'কল্লোল' বন্ধ হওয়ার দুইদশক পরে কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন–

> "'কল্লোল' উঠে যাবার পর কুড়ি বছর চলে গেছে। আরো কত বছর চলে যাবে, কিন্তু ওরকমটি আর 'ন ভূতো ন ভাবী'। দৃশ্য বা বিষয়ের পরিবর্তন হবে দিনে-দিনে, কিন্তু যে যৌবন-দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্য একদিন আলোকিত হয়েছিল তার লয়-ক্ষয়-ব্যয় নেই-সত্যের মত তা সর্বাবস্থায়ই সত্য থাকবে। যারা একদিন সে আলোক- সভাতলে একত্র হয়েছিল, তারা আজ বিচিত্র জীবননিয়মে পরস্পর- বিচ্ছিন্ন-প্রতিপূরণে না হয়ে হয়তো বা প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত-তবু, সন্দেহ কি, সব তারা এক জপমালার গুটি, এক মহাকাশের গ্রহতারা । যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরছে বটে, কিন্তু সব এক মন্ত্রে বাঁধা, এক ছন্দে অনুবর্তিত। এক তত্ত্বাতীত সত্তা-সমুদ্রের কল্লোল একেক জন। বাহ্যত বিভিন্ন, আসলে একত্র। কর্ম নানা আনন্দ এক। স্পর্শ নানা অনুভূতি এক।"[২২]

তরুণ লেখকদের সীমিত অভিজ্ঞতা এবং নতুন জীবনাদর্শ নিয়ে কল্লোলের পাতায় যে লেখা সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের মহড়া দিয়েছে। মহড়ার পরের কাহিনী হচ্ছে আসল কথা, সেখানেই সত্যাসত্য যাচাই হয়। তাই কল্লোলের ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজতে হবে শুধু তার সাত বছরের জীবনকালের মধ্যে নয়, কল্লোলোত্তর বাংলা সাহিত্যের মধ্যে। কল্লোলের শতবর্ষে এসে আমরা দেখছি কল্লোল পরবর্তীকালের লেখক সেই পথে হেঁটেছেন কিংবা হাঁটছেন এখনো।

তথ্যপঞ্জি

১. জীবেন্দ্র সিংহরায়, কল্লোলের কাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ.২৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

৫. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, এম,সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ.৮২

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১-১৩২

৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, পৃ.৯৭

১০. বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৭

১১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ.৪৭

১২. কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতাটি (কবি-নাস্তিক) 'কল্লোল' পত্রিকা ১৩৩১ মাঘ ১০ম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩. জীবেন্দ্র সিংহরায়, পৃ.৯৭

১৪. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

১৫. নির্বাচিত সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৯৫০), সম্পাদনা-অবিন্দম করিক, সুনীল নন্দী ও সৌমেন কুমার বেরা, পূর্ণ প্রতিমা, কলকাতা, ২০২১, পৃ.৩০৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৯

১৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ.৩-৪

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৯-২৮০

১৯. জীবেন্দ্র সিংহরায়, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫

২০. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯

২১. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২২. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫